Contents

ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

ইফাবা প্রকাশনা : ৪৭/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬১
ISBN : 984-06-1126-7

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৯

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৭
জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রুফ রিডার
নাজমুল আহসান

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

IMAM IBN TAIMYA (Life and Works of Imam Ibn Taimya—a great reformer of Islam) : Written by Moulana Muhammad Abdur Rahim in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2007

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 20.00 ; US Dollar : 0.75

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ছিলেন সপ্তম হিজরী শতকের একজন মুজাদ্দিদ। এ সময় মোঙ্গল আক্রমণে বাগদাদ কেন্দ্রিক মুসলিম রাজ্যগুলো ভয়াবহ ধ্বংসের কবলে নিপতিত হয়। একদিকে যেমন ধ্বংস হয় সমৃদ্ধ বাগদাদ ও দামেশ্‌ক নগরী, তেমনি অন্যদিকে রাজ্যহারা মুসলমানরাও নানা দল ও মতে বিভক্ত হয়ে ভ্রাতৃঘাতী কলহে নিমজ্জিত হয়। সামান্য কারণে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমান 'কাফের' ও 'ফাসেক' বলতে দ্বিধা করতো না। ধর্মবেত্তাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের ফলে মুসলিমদের জাতীয় সত্তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিল। পীরপূজা, কবরপূজা, ফেতনা-ফ্যাসাদ, নানা ধরনের কুসংস্কার ও ভ্রাতৃহিংসার বিষবাষ্পে যখন সত্যের দীপ্ত সূর্য প্রায় অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল এবং সারা দুনিয়ার উপর কাফেরী ও গোমরাহীর নিঃসীম অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময়ই ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতো মর্দে মুজাহিদের আবির্ভাব ঘটে দামেশ্‌কের মাটিতে।

তিনি বিদাআত, গোমরাহী ও ভ্রাতৃ-হানাহানির কবল থেকে মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের মৌলিক কাঠামোর উপর সংগঠিত করার জন্য ক্ষুরধার যুক্তি, আশ্চর্য তর্ক-শক্তি ও লেখনীর মাধ্যমে এগিয়ে আসেন। এজন্য তাঁকে সহ্য করতে হয় শাসক ও বিরুদ্ধবাদীদের অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন। বারবার শাসকের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তাঁকে, জীবনের একটি বড় অংশ কাটাতে হয় জেলে। কিন্তু কয়েদ-খানাতেও তিনি বসে থাকেন নি। কয়েদীদের মাঝেও তিনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে থাকেন। সত্যিকারের দীনের প্রতিষ্ঠায় শাসকের নির্যাতন, বিরুদ্ধবাদীদের রক্তচক্ষু কখনোই তাঁকে ভীত ও শংকিত করতে পারে নি। তাঁর সুচিন্তিত লেখনী কেবল তৎকালীন গোমরাহী ও বিদাআতের অপনোদনই করেনি, তাতে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনাও রয়েছে।

বিশিষ্ট আলিম, খ্যাতিমান লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জীবন ও অবদানের কথা তুলে ধরেছেন 'ইমাম ইবনে তাইমিয়া' শীর্ষক বইটিতে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সলে এবং এর দ্বিতীয় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। বর্তমানে বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে জানাচ্ছি অশেষ শুকরিয়া।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

ইসলামী ইতিহাসের অগ্নিপুরুষ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অমূল্য জীবন কাহিনী মুসলমানদের দীন ভিত্তিক জাতীয় ও তামাদ্দুনিক আন্দোলনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাহিলিয়াতের সর্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে মুসলিম মানস ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য অবিশ্রান্ত সাধনা ও সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জীবন হইতে যে দুরন্ত প্রেরণা লাভ করা যায় এবং ইসলামের দুশমন-শক্তির সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া শাসকদের রোষদৃষ্টিতে পতিত হওয়া ও মাসের পর মাসই নহে, বছরেরর পর বছর ধরিয়া কারাগারের অন্ধকুঠরিতে সানন্দে বন্দী হইয়া থাকার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইমাম ইবনে তাইমিয়ার চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়, মানব-ইতিহাসে তাহার তুলনা সংখ্যাতীত নহে।

ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া ছিলেন সপ্তম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ। জাহিলিয়াতের সর্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য তাঁহার সম্পাদিত বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম ইতিহাসের এক চিরউজ্জ্বল অধ্যায়। মুসলিম জাতির তামাদ্দুনিক আন্দোলনের দৃষ্টিতে তাহা নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সম্পদ।

অতীত মহান ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনী পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় ও তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রে ইহার সুদূর প্রভাব প্রবর্তিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। উপরন্তু অতীতের সহিত সম্পর্কহীন কোন জাতির বিন্দুমাত্র অগ্রগতি কিংবা উৎকর্ষ লাভ আদৌ সম্ভব নহে। বর্তমান মুসলিম জাতিই ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

এই জাতির মৃতমানসে ইসলামী চিন্তা ও কর্মবিপ্লবের প্রবল আলোড়ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই জাতির জীবন-সমুদ্রে আবার ঝড়ের তাণ্ডব সৃষ্টি হোক, চুরমার হইয়া যাক সমস্ত হীনতা, নীচতা, অধোগতি ও পরানুকরণের রসাতল, ধুইয়া মুছিয়া যাক সকল পঙ্কিলতার ক্লেদ এবং মুসলিম জাতি তাহার সুন্দর ও মহান আদর্শিক বুনিয়াদে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হোক, ইহাই হইতেছে গ্রন্থকারের একমাত্র কামনা। পাঠকদের মধ্যে কাহারো মনে ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়ার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের ক্ষীণতম দোলারও সৃষ্টি হইলে লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

খৃস্টীয় তেরো এবং চৌদ্দ শতকের মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক। ইসলামী খিলাফতের বুনিয়াদ বহু পূর্বেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুসলিম জাতির বীরত্ব ও বিক্রম এক্ষণে পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। বিশ্ব-বিজয়ী মুসলিম কাফেলার পদচিহ্ন বাস্তব জগতের বুক হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। চারিদিকে বিশৃংখলা, অশান্তি আর সর্বব্যাপী মহাভাঙনের সূচনা হইয়াছে। ইসলামের সর্বশেষ গৌরব-রবি বীর সালাহুদ্দিনের বংশধরগণ নিস্তেজ ও নিষ্কর্মা হইয়া পড়ায় তাঁহাদেরই 'মামলুক' দাসগণ মিসরের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রায় ষোল শতক পর্যন্ত এই মামলুকগণই মিশরের শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহাদের রাজশক্তি রাত্রি-শেষের তেলহীন প্রদীপের মত নির্বাণোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল—যেকোন এক ফুৎকারে এই স্তিমিত প্রদীপ অতি সহজেই নিভিয়া যাইতে পারে।

ঠিক সেই সময়ই ইতিহাসের অন্য এক পটভূমিকায়, সমস্ত সভ্য জাতির সূক্ষ্মদৃষ্টির অন্তরালে মঙ্গোলিয়ার সীমাহীন, শোভাহীন ও গৃহহীন উন্মুক্ত মরুপ্রান্তরের বুকে আগ্নেয়-গিরির এক ভয়ানক অগ্ন্যুদ্গিরণের আয়োজন পূর্ণ হইতেছিল। ইসলামের বিশ্বপ্লাবী সভ্যতার আলোকে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই ধন্য ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মঙ্গোলিয়ার মরুচারী তাতারদিগকে সেই আলোক মোটেই স্পর্শ করিতে পারে নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অসভ্য মানুষের মতই তাহারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তীর-ধনুকের সাহায্যে বন্য-পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। মেষের চামড়া তাহাদের শীতের বস্ত্র আর চিরপরিবর্তনশীল তাম্বু তাহাদের আশ্রয়স্থল। সেখানকার আবহাওয়া মানুষকে হিংস্র জন্তুর মত ভীষণ করিয়া তোলে এবং যুদ্ধ ও রক্তপাত তাহাদের কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দ্বাদশ শতকের শেষভাগে এই দয়ামায়াহীন অসভ্য বর্বর জাতি এক দলপতির অধীনে সম্মিলিত হয়। ইনিই সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিষ্ঠুর "আল্লাহ্র গজব" চেঙ্গীজ খান। তেরো শতকের প্রারম্ভে ইনি সমস্ত তাতার জাতিকে স্বীয় শাসনাধীন করিয়া লইয়াছিলেন এবং সুদূর চীনের উপরও তাঁহার অপ্রতিহত শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

চেঙ্গীজ খানের সর্ব প্রথম সংঘর্ষ বাধে বোখারার অধিপতি সুলতান মুহাম্মদের সঙ্গে। জীহুন নদীর উত্তরে অবস্থিত বিশাল প্রান্তরে সুলতানের চারি লক্ষ সৈন্য চেঙ্গীজকে

আক্রমণ করে এবং প্রথম দিনের যুদ্ধে উহাদের মধ্যে এক লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য নিহত হয়। অতঃপর সুলতানের অবশিষ্ট সৈন্য তাতারদের প্রবল ফুৎকারের সম্মুখে শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত নিঃশেষে উড়িয়া যায়। তাহার পর দুর্ধর্ষ তাতার সৈন্যগণ মুসলিম রাজ্যগুলির চারিদিকে মহাপ্লাবনের মত ছড়াইয়া পড়ে। সভ্য ও তামাদ্দুনিক জাতিগুলির বিরুদ্ধে তাহাদের মনে এক মহা প্রতিহিংসা জাগিয়াছিল। তাই শহর নগর, ঘর-বাড়ী এবং সভ্য মানুষ ও সভ্যতার উপকরণ যাহা কিছুই তাহাদের সম্মুখে পড়িয়াছে, তাহাই তাহারা নিষ্ঠুর হস্তে ধ্বংস করিয়াছে। সুসমৃদ্ধ দামেশ্ক ও বাগদাদ শহর উহাদের অত্যাচারের তাণ্ডবনৃত্যের তলে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। অসহায় নিরীহ জনসাধারণ আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল ; কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত কোন ক্ষমতাই কাহারও ছিল না। কোটি কোটি নিহত মানুষের রক্তের বন্যা-প্লাবনে মুসলিম রাজ্যগুলি একেবারে ভাসিয়া গেল।

মুসলমানদের এই রাজনৈতিক পতনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের দিক দিয়াও তাহারা পৌঁছিয়াছিল অধঃপতনের চরম সীমায়। দলাদলির কারণে মুসলমান জাতি ৭০ দলেরও বেশী সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মের দোহাই দিয়া এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে হত্যা করিত। পানির সহিত খেলা করার মতই অতীব অনায়াসে মানুষের রক্ত লইয়া অমানুষিক খেলা চলিত। একদল মুসলমান আর এক দলকে "কাফির" ও "ফাসিক" বলিয়া আখ্যা দিত। মুসলমানদের এই পারস্পরিক দলাদলি ও হিংসা-দ্বেষের ফলেই তাতার সৈনিকগণ মুসলিম রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আলিমগণের পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষের ফলে জাতীয় সত্তার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক দলের আলাদা বিচারক ও প্রত্যেক দলপতি নিজের ইচ্ছামত চলিত এবং অন্যদেরও পরিচালিত করিত। তৎকালীন মুসলমানগণ এইরূপ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ার ফলেই দুনিয়ার বুকে তাহারাই একেবারে নিকৃষ্ট ও হেয় প্রতিপন্ন হইতেছিল।

পীরপূজা, কবরপূজা, অন্ধ কুসংস্কার—মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলাকে ছাড়িয়া দুনিয়ার ছোট-বড় সব রকমের জিনিসেরই অযাচিতভাবে পূজা হইতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার ভয় মানব-সাধারণের মন হইতে একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছিল। জাতির সমষ্টিগত শক্তিকে খামখেয়ালী দেব-দেবীর পাদমূলে বলিদান করা হইয়াছিল। কুরআনের বিশুদ্ধ এবং সহজ সরল কর্মপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এবং তথাকথিত সুফিয়ানে কিরামের কথার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিত তৎকালীন মানুষের ধর্মবিশ্বাস, রচিত হইত অনাবশ্যক কার্যাবলীর এক দীর্ঘ ফিরিস্তী। চারিদিকে খানকাহ্, পীর এবং ভণ্ড দরবেশদের ভিড় লাগিয়াই ছিল। বিদয়াতেরই নাম ছিল ঈমান, ফলে ঈমান একটি প্রাণহীন জড় বিশ্বাস মাত্রে পরিণত হইয়াছিল।

তাকলীদ বা অন্ধভাবে পরের অনুসরণ-প্রবণতা মিল্লাতে ইসলামীয়ার একটা বিরাট অংশকে স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও মানসিক আজাদী হইতে সম্পূর্ণরূপে

বঞ্চিত হইয়াছিল। সংকীর্ণ দৃষ্টি, সংকীর্ণ চিন্তা, সংকীর্ণ মন এবং অনুদারতা ও কপটতাই ছিল তৎকালীন আলিমদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানের রাজ্যে ক্রমাগত অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মর্মানুপ্রেরণা ও উদ্দামতা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল। মানুষের চরিত্র বরবাদ হইয়া গিয়াছিল এবং দীন ও ঈমানের আসল রূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

মোটকথা সত্যের দীপ্ত সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল এবং সারা দুনিয়ার উপর কাফিরী ও গোমরাহীর নিঃসীম তমসা গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। ঠিক এই সময়ই জ্ঞান ও হিদায়াতের একটি প্রদীপ্ত সূর্য দামেশকের আকাশে উদিত হয়, যাহার নির্মল জ্যোতিঃপ্রভায় মাশরিক ও মাগরিবের প্রতিটি কোণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

সহীহ্ হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক শতকের প্রথমেই একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি আল্লাহ্‌র দীনকে দুনিয়ার বুকে নতুন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।" মিল্লাতে ইসলামের অতীত ইতিহাস এই হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। দুনিয়া যখন ফেত্না ফাসাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পাপ ও আল্লাহ্‌দ্রোহিতার কালো মেঘ যখন সত্যধর্মের সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে, প্রকৃত তওহীদবাদীদের পক্ষে এই বিশাল দুনিয়া একেবারে দুঃসহ হইয়া পড়ে, কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা কাহিনীই যখন "ধর্ম" বলিয়া নিরূপিত হয়, আলিম সমাজ যখন ব্যাপকভাবে সত্য গোপন করিতে ও সত্যকে বিকৃত করার মত দুঃসাহসিক কাজ করিতে শুরু করে, প্রত্যেকটি মানুষের মন ও ঘর যখন অসংখ্য উপাস্য দেবতায় ভর্তি হইয়া যায়, দুনিয়াতে যখন বিন্দুমাত্র শান্তি থাকে না, সুখ থাকে না, ভয় ও আশঙ্কা, বিপদ ও বিপর্যয়ের বিজলী চমক যখন বারবার দিকচক্রবালের দূর কোণে কোণে জ্বলিয়া উঠিয়া মানব-বংশকে তাবাহী ও বরবাদীর পয়গাম দিতে থাকে; জুলুম, অনাচার, রক্তপাত ও হিংস্র পাশবিকতা রাজ্যের একমাত্র আইন হইয়া বসে; দুর্বল মানুষের পক্ষে শক্তিমানের শোষণ পীড়নের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকার আর কোনই উপায় না থাকে, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত উথলিয়া ওঠে। বিশ্ব-মানবের একমাত্র জীবন-বিধান হিসাবে ইসলামকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, মানব সাধারণের মুক্তিবিধানের নিমিত্ত গরীব ও কমজোরদের সহায়তা ও সংরক্ষণকল্পে এক অভূতপূর্ব শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রকাশ করে।

বেবিলন যদি শিরক্ ও কুফরী, অশ্লীলতা ও পাপকার্যের নিম্নতম পংকে পতিত না হইত, তবে সম্ভবত হযরত ইবরাহীমের আবির্ভাব ঘটিত না, লূত কওমের অন্যায় আচরণ পাপ প্রবণতা লূত নবীকে পয়দা করিয়াছিল, বনী ইসরাঈলের তাহাবী মূসা নবীর আত্মপ্রকাশের কারণ হইয়াছিল; ইহুদীদের শোচনীয় অবস্থা ঈসা নবীর বিকাশ ঘটাইয়াছিল, আরব জাতির বর্বরতা ও মূর্খতা—তথা সারা বিশ্ব আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাওয়ার ফলে এবং বিবিধ পাপ ও অনাচারের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হওয়ার কারণে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) "রাহমাতুললিল আলামীন" হইয়া দুনিয়ার বুকে আগমন করিয়াছিলেন। তাতার ও মঙ্গোলীয়দের ভয়াবহ ফেতনা ইরানে পয়দা করিয়াছিল

শেখ সা'দীকে ; আর সিরিয়া দামেশককে জন্ম দিয়াছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে। মু'তাজিলাবাদের মারাত্মক বিপর্যয় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে ইসলামী দুনিয়ার আকাশে সূর্যের জ্যোতি লইয়া উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তাইমূরের রক্তপাত ও হত্যালীলা হাফিজ ও নিজামীকে সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতে মোগলশক্তির ইসলাম-দ্রোহিতার ফলে মুজাদ্দিদে আলফেসানী আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং পরে শাহ্ অলীউল্লাহ্ দেহলভী ও শাহ্ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (র) এক বিরাট শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব এমন এক সময় ঘটিয়াছিল, যখন দুনিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া মঙ্গোলীয়দের নিষ্ঠুর হত্যালীলার প্রবল আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আর ধর্মের দিক দিয়া অসংখ্য নূতন নূতন ইসলাম-বিরোধী মতবাদ ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়াছিল। কবরপূজা, পীরপূজা, উরুসবাজি এবং অন্যান্য বাতিল চিন্তাধারা ও কুসংস্কার ঈমানের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইসলামের বিশুদ্ধ ধারণা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলিম জাহানের এহেন কঠিন দুরবস্থা ও সর্বব্যাপী ভাঙনের সময় ইমাম ইবনে তাইমিয়া আবির্ভূত হইয়া এই সব ফাসিদ ও বাতিল আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জিহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। জিহাদ করিয়াছিলেন কলম ও মুখের দ্বারা, হাতে ও তরবারি দ্বারা। দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, বিপদের আকাশছোঁয়া তুফানের মধ্যে নির্ভীকচিত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। বন্দী হইয়াছেন, কারাগারের দুঃসহ জ্বালা অকাতরে সহ্য করিয়াছেন ; ন্যায়ের খাতিরে রাজা-বাদশা ও আমির-ওমরার বিরোধিতা করিয়া তাহাদের চক্ষুশূল হইয়াছেন। তিরস্কার, নির্যাতন, অপমান, উৎপীড়ন নীরবে বরদাশ্ত করিয়াছেন, বদনাম ও কুখ্যাতি খরিদ করিয়াছেন। কিন্তু এই সবের মধ্যেও তিনি দৃঢ়সংকল্প, একাগ্রচিত্ত ও একনিষ্ঠ হইয়া, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বীরত্ব ও নির্ভীকতা এবং অটল আদর্শবাতার নজীর দেখাইয়াছেন। কাহারো ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষে তিনি কখনও ভীত ও শঙ্কিত হন নাই। কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বিশ্ব-মানবকে দেখাইয়া গিয়াছেন সত্যের জন্য আত্মদান কাহাকে বলে, ঈমানের তেজস্বিতা ও প্রকৃত ধার্মিকতার বাস্তব পরিচয় কি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে এইসব উক্তি বস্তুতপক্ষে কোন কাব্য নয়, অমূলক উচ্ছ্বাসও নয়। ইহা অতীব সত্য কথা, ঐতিহাসিক ভিত্তিযুক্ত কাহিনী! তাঁহার মৃত্যুর পর ৭/৮ শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, আজও তাঁহার বহুমূল্য গ্রন্থমালা, একদিকে মিসর, হিজাজ ও ইরানের অসংখ্য লাইব্রেরীর শোভা বর্ধন করিতেছে, আর অন্যদিকে বার্লিন, লণ্ডন, ফ্রান্স ও রোমের সংখ্যাতীত পাঠাগারের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

তিনি অন্যদিকে লেখনী চালাইয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া শরীয়াতে ইসলামকে নূতনভাবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, সত্য ও ন্যায়ের সিরাতুল মুস্তাকিমকে আর একবার রওশন করিয়াছেন এবং গোমরাহীর মরুভূমিতে বিভ্রান্ত পথিকদের আল্লাহ্ তা'আলার

হুকুমত কবূল করিবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু শুধু এতটুকু করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই বরং সেই সঙ্গে উন্মুক্ত শাণিত তলওয়ার হাতে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এমন বীরত্ব ও বিক্রমের পরিচয় দিয়াছেন যে দুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

তিনি তাঁহার তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা দ্বারা দেশের চারিদিকে নব জীবনের এমন প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছেন যে তাতার পশুগণের স্পর্ধা বিক্রমকেও উহার সম্মুখে প্রতিরুদ্ধ হইয়া ব্যর্থ হইতে হইয়াছে। মোটকথা লেখনী, প্রতিভা, বক্তৃতাশক্তি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিবার বিক্রম—আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সবকয়টি শক্তিকেই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়া তিনি ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিস্তারিত জীবন কাহিনীই ইহার সাক্ষ্য দিবে।

জীবনী

ইবনে তাইমিয়ার পূর্ণ নাম তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহ্মদ। তাঁহার পিতার নাম শেহাবুদ্দীন আবুল মাহাসিন আবদুল হালীম। ইবনে তাইমিয়ার ঊর্ধ্বতন বংশ 'তাইমিয়া' হইতে শুরু হইয়াছে। তাইমিয়া তাকীউদ্দিন আহমদের সাতপুরুষ পূর্বের একজন দাদীর নাম। তিনি নিজে একজন শ্রেষ্ঠ বিদূষী, শুদ্ধভাষিণী এবং বাগ্মী নারী ছিলেন। তাঁহার মনীষা ও বিদ্যা-বৈদগ্ধের খ্যাতি সিরিয়ার বাহিরেও বহু দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এইজন্যই তাঁহার অধঃস্তন সমস্ত পুরুষই তাঁহার নামে পরিচিত হইয়াছে। তাকীউদ্দীন আহ্মদের পিতা ও পিতামহ সমসাময়িককালে এক-একজন নামকরা আলিম ও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। এহেন বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন বংশে ৬৬১ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের দশ তারিখে আহমদ বিন তাইমিয়া সিরিয়ার হাররান নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত তাইমিয়া এই হাররানেই বসবাস করিয়াছেন। অতঃপর দুর্ধর্ষ তাতার সৈনিকগণ যখন এই দেশের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং এতদঞ্চলের সমস্ত মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইতে চলিয়াছিল তখন ইবনে তাইমিয়ার পিতাও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দামেশকের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইবনে তাইমিয়ার শিক্ষা প্রথমত আপন ঘরেই আরম্ভ করা হইয়াছিল। প্রথমে তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক কিতাবাদি পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিরিয়ার সরজমীনে হাদীসের ইমাম, ফিকাহশাস্ত্রবিদ, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পণ্ডিতের কোনই অভাব ছিল না। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হন এবং তৎকালীন বড় বড় সুদক্ষ ওস্তাদের নিকট ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

জন্মগত প্রতিভা ও সুযোগ্য ওস্তাদের নিকট উচ্চতর জ্ঞান শিক্ষা পাওয়ার ফলে ইবনে তাইমিয়ার অন্তর্নিহিত বিরাট শক্তিসমূহের বিস্ময়কর স্ফুরণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা,

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার খ্যাতি ইতিমধ্যেই সভ্য দুনিয়ার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করার প্রথম ধাপে পৌঁছিতেই দুনিয়ার চতুর্দিক হইতে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা, ভক্তি, সুনাম ও সুখ্যাতির বিপুল পুষ্পরাজি বর্ষিত হইতে শুরু করিয়াছিল। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার দক্ষতা তদানীন্তন আলিম সামজের মধ্যে সত্যই অতুলনীয় ছিল। এইজন্যই তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে এই কথাটি প্রত্যেক মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হইত—"ইবনে তাইমিয়া যে হাদীসকে হাদীস বলিয়া জানেন না, তাহা আদতেই হাদীস নহে।" ইলমে তফসীরেও তাঁহার তুলনা মিলিত না। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করিয়া ফতোয়া দিতেন এবং পূর্বতন তফসীরকারদের ভ্রান্তি পরিষ্কার ভাষায় ধরাইয়া দিতে পারিতেন। ইবনে তাইমিয়া এই সমস্ত জ্ঞান-বৈদগ্ধ ও অতুলনীয় দক্ষতা মাত্র বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি বিভিন্ন জটিল বিষয়ে ফতোয়া দান ও শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সম্পূর্ণ কুরআনের হাফিজ ছিলেন বলিয়া মুখে মুখে কুরআনের আয়াত পাঠ করতঃ উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুনাইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, সরস ও সুমিষ্ট ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর বলেন ঃ ইবনে তাইমিয়ার উপদেশপূর্ণ অপূর্ব ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া কত বড় বড় পাপী ও আল্লাহ্‌দ্রোহী ব্যক্তি যে তওবা করিয়া সৎপথ লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অধ্যাপনার সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বকথার রহস্যদ্বার তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া যাইত। প্রত্যেকটি বক্তব্য বিষয়ে তিনি কুরআনের আয়াত, হাদীস, আরবী কবিতা ও পূর্বগামী মনীষীদের উক্তি উল্লেখ করিয়া যুক্তি পেশ করিতেন। শেখ সালেহ তাযুদ্দিন বলেন ঃ "আমি ইবনে তাইমিয়ার অধ্যাপনা-কক্ষে রীতিমত হাজির হইতাম। তিনি সয়লাবের মত উদ্দাম হইয়া ছুটিতেন, খরস্রোতা নদীর মত প্রবাহিত হইতেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী চক্ষু বন্ধ করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত ও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। অধ্যাপনা শেষ হইয়া গেলে তাঁহাকে অধিকতর গম্ভীর ও ভয়াকুল বলিয়া মনে হইত। তখন তিনি ছাত্রদের সাথে স্নিগ্ধ হাসি ও খোশ-মেজাজের সহিত কথা বলিতেন। মনে হইত, অধ্যাপনার সময় তিনি কোন এক অদৃশ্য রহস্যলোকে গায়েব হইয়া গিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন দুনিয়ার এই বাস্তবলোকে।"

ইবনে তাইমিয়া ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক আল্লামা কামালুদ্দিন বহু ব্যাপারে তাঁহার সহিত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সম্পর্কে এই উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছেন—

"তাঁহার নিকট আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান অতীব সহজ করিয়া দিয়াছিলেন—দায়ুদ নবীর জন্য যেমন কোমল করিয়াছিলেন লৌহকে।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার জীবনের অধিকাংশ সময় যদিও কারাগারের বন্দীখানায় অতিবাহিত হইয়াছে, মানব-সেবার সময় এবং অবকাশ যদিও তিনি খুব কমই পাইয়াছেন, তবুও তাঁহার অল্পকালীন শিক্ষকতার সময়ের মধ্যেই তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত

ছাত্রদের সংখ্যা কয়েক হাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকজন ছাত্র তো বিদ্যায়, জ্ঞানে, প্রতিভায়, কর্মদক্ষতায় ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যে তৎকালীন দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন-ব্যাপী সাধনা-প্রসূত অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ এক একটি অক্ষয় মনুমেন্টের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া আজও তাঁহাদের অনন্যসাধারণ কীর্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আল্লামা ইবনে কাইয়েম, আল্লামা জাহ্বী, হাফিজ ইবনে কাসীর, হাফিজ ইবনে কুদামাহ, কাজী শরফুদ্দীন, শেখ শরফুদ্দীন প্রভৃতি মনীষী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে তাইমিয়ার ছাত্রসংখ্যা অগণ্য, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকজনের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র মাহাত্ম্য, ইল্‌ম ও সম্মানের অমিয় ধারা হইতেই নিখিল দুনিয়া চিরকাল উপকৃত ও ধন্য হইবে। তাঁহাদের বিরাট ও অমূল্য গ্রন্থমালা মানবজাতির তাহজিব ও তামাদ্দুন, বিশ্বাস ও চিন্তার জগতে কী বিরাট ইনকিলাবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা এই প্রবন্ধে অসম্ভব। ইবনে তাইমিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতি-প্রভা ইসলাম জগতের প্রতিটি কোণকে চমকিত ও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহার জীবনদায়িনী লেখনীর সাহায্যে মানুষের জীবনে এমন স্বতঃস্ফূর্ত ফোয়ারা উৎসারিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে অসংখ্য নদী-নালা জাগিয়া উঠিয়া পৃথিবীর চারিদিকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদ্বেলিত অমিয়ধারা প্রবাহিত করিয়াছে।

তাঁহার শিক্ষকতার জীবন নিছক অধ্যাপনার কাজেই অতিবাহিত হয় নাই। এই সময় তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখনী কত তীব্র ও ক্ষুরধার ছিল এবং অনন্তকালের জন্য তিনি কোন্ অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা আমরা স্বতন্ত্রভাবে করিব। কিন্তু তাঁহার সুতীক্ষ্ণ লেখনী খোঁচায় সর্বপ্রথম বাতিল আকিদা ও ফাসিদ মতবাদের উপর যতখানি আঘাত পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে তাঁহার নিজের জীবনে যে দুঃখের অমানিশা নামিয়া আসিয়াছে, এখানে আমরা তাহার আলোচনা করিতে চাই।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগেই যখন আরবী ভাষায় গ্রীকদর্শনের অনুবাদ শুরু হইয়াছিল তখন হইতেই আরবদের তথা মুসলিম সমাজের উপর গ্রীক-দর্শনের বস্তুবাদী মতবাদের তীব্র প্রভাব পড়িয়াছিল। ফলে মানুষ খাঁটি ইসলামী চিন্তাপদ্ধতি ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ হারাইয়া ফেলিয়া বুদ্ধি দ্বারা পরখ করা শুরু করিয়াছিল। প্রত্যেকটি বিষয়কেই—তাহা পার্থিব হউক কি অপার্থিব, বস্তুভিত্তিক হউক কি আধ্যাত্মিক কোন মু'জিযা বা সাধারণ ও অস্বাভাবিক ঘটনাই হউক না কেন তাহারা সব কিছুকেই সাধারণ বুদ্ধির নিক্তিতে ওজন করিতে শুরু করিয়াছিল। ক্রমশ মুসলিম সমাজে এমন একটা দল আত্মপ্রকাশ করিল, যাহাদের নাম 'আবদুল্লাহ্' বা 'আবদুর রহমান' ছিল বটে, কিন্তু আত্মা, মন ও মগজ ছিল সম্পূর্ণ গ্রীক। প্রকৃতি বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বে তাহাদের দীক্ষাগুরু ছিল গ্রীক। গ্রীক চোখ দ্বারা তাহারা দেখিত, গ্রীক মগজ দিয়া তাহারা চিন্তা

করিত। ইহারই নাম হইতেছে মু'তাজিলাবাদ। বনু উমাইয়া সুলতানাতের সময়ই এই মত রাজধানী কুফা নগরে দানা বাঁধিয়া ওঠে। হাসান বসরীর সাগরেদ ওয়াসেল বিন্ আতা' এই যুক্তিবাদী আন্দোলনের উদ্যোক্তা। আব্বাসী রাজত্বের প্রথমভাগে এই আন্দোলন এক অন্ধ আবেগের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই মু'তাজিলা-বাদের তুমুল ঝগড়ায় জাগিয়া উঠিয়াছিল "খালকে কুরআনের" বা কুরআন রচিত হওয়ার মতবাদের সমস্যা। এই বিষয়টি লইয়া আব্বাসীদের আমলে যে প্রচণ্ড ঝড়ের উন্মত্ত মাতম সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহা এক প্রলয়ের ইতিহাস। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কত দুঃসহ দুঃখ ও নিপীড়নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এই "খালকে কুরআনের" মতের বিরোধিতা করিতে গিয়া, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ৮৩৩ ইসায়ীতে মা'মুন আব্বাসী মু'তাজিলাবাদ কবুল করিয়াছিলেন। ফলে ইহা সমগ্র রাজ্যের সরকারী ধর্মমতের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী বাদশাহ ওয়াসেক বিল্লাহ এই মত সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছিল এবং মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ এই আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের এই দমন-নীতির খুব কড়াকড়ি দেখিয়া মু'তা-জিলাগণ তাহাদের বাহ্যমূর্তি বদলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। জনমত সম্পূর্ণভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে চলিয়া যাওয়ায় তাহাদের বুলন্দ আওয়াজ একেবারে স্তব্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। কালের স্রোত যখন একেবারে প্রতিকূল, তখন তাহাদের পূর্ব পোশাক বদলাইয়া "মুতাকাল্লিমীন"—তর্ক শাস্ত্রবিদ-এর আবরণ অঙ্গে ধারণ করিতে শুরু করিল। মু'তা-জিলাবাদ কুরআন পন্থীদের গ্রীক-দর্শনের দুর্জয় প্রভাবে পরাজিত ও প্রভাবান্বিত করিতে-ছিল, আর এই কালাম-শাস্ত্র মুসলিম সমাজকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও জটিলতম মন্তেকী রহস্যঘন আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়া বাস্তব কর্মজগত হইতে একেবারে গাফিল করিয়া দিতে শুরু করিয়াছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া যখন সারা মুসলিম দুনিয়াকে এই অবাঞ্ছনীয় ও অর্থহীনভাবে গাফিল হইতে ও গোমরাহীর পথে দ্রুত ধাবিত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি এই মতের বিরুদ্ধে কলম ধরিলেন।

৬৯৮ হিজরীতে তিনি একটি প্রশ্নের জওয়াবে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তাহাতে তিনি 'মুতাকাল্লিমীনের' আকীদা ও খেয়ালতের তীব্র সমালোচনা করেন এবং উহাকে বাতিল প্রমাণ করিয়া খালিস কুরআন ও হাদীসের আদর্শকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "মুতাকাল্লিমীনের ধারণা এই যে, সাহাবা ও তাবিয়ী'দের বিশ্বাস ও মত খুবই সাদাসিধা ছিল, সূক্ষ্ম চিন্তা ও গবেষণার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। পক্ষান্তরে উহাদের দাবী এই যে, আধুনিক কালাম-শাস্ত্রবিদগণ ইল্ম ও গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলিমদের চেয়ে অনেক অগ্রণী হইয়াছেন।"

"এই দাবী যে ভয়ানক মূর্খতার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বুদ্ধির অন্ধ মানুষগুলি জানে না যে, আসহাব ও তাবিয়ী'গণ মূর্খতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার জগত হইতে ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের সমুজ্জ্বল জগতে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহাদের চলার

পথে শুবাহ্-সন্দেহের কাঁটা ছিল না, আন্দাজ-অনুমানের নিবিড় বনানী ছিল না। মন্তেক ও ফালসাফার কুটিলতা ও অনাবশ্যক জটিলতাও ছিল না। অন্যদিকে এই মুতাকাল্লিমীনের চিন্তাগর্বীদল ভিত্তিহীন ধারণা এবং সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার নিরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রে নিরন্তর আঘাতের পর আঘাত খাইয়া চলিয়াছে; ইসলামের সহজ ও সরল পথ হারাইয়া গোমরাহীর বাঁকাপথে বারবার আছাড় খাইতেছে! সত্য ও ন্যায়-নীতি তাঁহাদের অঞ্জন মাখা চোখে এখন আর ধরা পড়িতেছে না। বড় বড় দার্শনিকগণ আজীবন দর্শন-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যালোকে নিরুদ্দেশ ঘুরিয়া মরিয়া নির্মমভাবে ব্যর্থ হইয়া শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে—মুতাকাল্লিমীনের পথ পর্যবেক্ষণ করিয়া নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, রুগ্ন আত্মার ঔষধি এখানে নাই। অতীব উত্তম ও নিরাপদ পথ হইতেছে কুরআনের পথ! এই গোমরাহ পথের অভিযাত্রীদের অবস্থা যখন এই, তখন তাহারা সেই সব মহামানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে কেমন করিয়া—যাঁহাদের প্রিয় বিশ্বনবী আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত মহান সত্য ও ন্যায়ের প্রাঞ্জল শিক্ষা দান করিয়াছিলেন—যাঁহাদের সম্মুখে অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনা উন্মুক্ত করিয়া ধরা হইয়াছিল।—যাঁহারা কুফরী ও নাফরমানীর গাঢ় তমসার বুকে জীবন্ত সূর্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন—যাঁহারা পবিত্র কুরআন দুই হাতে ধারণ করিয়া সমগ্র দুনিয়ার বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীরের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহাদের জ্ঞান ও বৈধগ্ধ বনী ইসরাঈলের আম্বীয়ায়ে কিরামের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।"

"ইহারা একদিকে তো দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের সত্যতা মাথা নত করিয়া সমর্থন করিতেছে, অপরদিকে কুরআন হাদীসের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখিয়া চলিতে আগ্রহান্বিত! বস্তুত ইহারা না পুরা দার্শনিক, আর না পুরা ঈমানদার—ইহারা খুবই ভয়ানক!"

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ইহা প্রথম গ্রন্থ—তাঁহার সংগ্রামশীল দুঃখময় জীবনের পথে এই প্রথম পদক্ষেপ। ইহা তদানীন্তন মুসলিম দুনিয়ায় এক ইনকিলাব সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পুস্তিকাখানি ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের বুকে এমন তীরের আঘাত হানিয়াছিল যে, সমগ্র কালাম-শাস্ত্রবিদ তাঁহার বিরুদ্ধে কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেল! ফলে মিসর ও সিরিয়ার কয়েক হাজার বর্গমাইলের মধ্যে ইমামের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম সাহসের কথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রত্যেকটি চোখ তাঁহাকে দেখিতে উদ্গ্রীব, প্রত্যেকটি কান তাঁহার সুমধুর ও জ্ঞানগর্ভ বাণী শুনিতে উৎকণ্ঠিত! তখন তিনি নিজের বিরাট দায়িত্বের কথা বুঝিতে পারিলেন এবং ভ্রান্ত দলগুলির বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্য জিহাদে আত্মনিয়োগ করিলেন। দুনিয়ার সমস্ত বিদ'য়াতপন্থীদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুফীবাদ, মুতা'জিলাবাদ, অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ এবং অন্যান্য বাতিল মতবাদের এমন তীব্র সমালোচনা করিলেন যে, শয়তানের চেরাগ একেবারে নিভিয়া যাইতে লাগিল! আন্দাজ-অনুমানের দুর্গ ভাঙিয়া মিসমার হইয়া গেল। ইমাম খাঁটি

ইসলামকে দুনিয়ার বুকে আর একবার নূতন করিয়া এমনভাবে তুলিয়া ধরিলেন যে, তাহার তুলনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুনিয়ার ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার এই বিপ্লবী বয়ান ৬৯৮ হিজরীতে যখন প্রকাশিত হইল, তখন চারিদিকে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিরোধী দল সরকারী বিচারককে নিজেদের পক্ষে টানিয়া লইল এবং তাঁহার দ্বারা এই নির্দেশ জারী করাইল যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া ভবিষ্যতে আর ফতোয়া দিতে কিংবা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইমামের পক্ষেও একটি বিরাট দল আসিয়া সমবেত হইল, তাহাতে তাঁহার শক্তি অধিক বৃদ্ধি পাইল এবং বিপক্ষের উৎপীড়ন ইহাতে তিনি এইবারের মত রেহাই পাইলেন।

কিন্তু ইহার পর তাঁহার মতবাদ সম্পর্কে মিসর অধিপতি নাসের শাহের নিকট ক্রমাগতভাবে অভিযোগ উত্থাপিত হইতে লাগিল। তিনি বাধ্য হইয়া ৭০৫ হিজরীতে দামেশকের গভর্নরকে আদেশ দিলেন স্থানীয় আলিমদের একটি মজলিস করিয়া ইমামের মতবাদ পরীক্ষা করিবার জন্য। ফলে গভর্নরের বাড়ীতে আলিমদের এক বৈঠক বসিল। গভর্নর ইমামকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ এই মজলিস আপনার মতবাদ পরখ করিবার উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছে। কারণ আপনি চিঠিপত্র দ্বারা মিসরবাসীদের আপনার মত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।” ইমাম বলিলেন—“দেখুন, মতবাদ গঠনকারী আমি নিজেই নই, আর যিনি আমার চেয়েও বড় তিনিও নন। বরং আমার সমস্ত মতবাদ কুরআন-হাদীসকে ভিত্তি করিয়াই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। তারপর চিঠিপত্র সম্পর্কে কোন অভিযোগ সত্য নয়। আমি নিজে কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিয়া প্রোপাগাণ্ডা করি নাই, আমি কতগুলি প্রশ্নের জওয়াব দিয়াছি মাত্র।” অতঃপর ইবনে তাইমিয়ার ধর্মমত পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্নরের বাড়ীতে পরপর কয়েকটি বৈঠক বসিল। প্রত্যেক বৈঠকেই তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ আলিমগণ উপস্থিত ছিলেন। ইমাম তাঁহার লিখিত দীর্ঘ বয়ান পড়িয়া শুনাইলেন। মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লইয়া তুমুল আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইল। কিন্তু সর্বশেষে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যের পতাকাকেই উন্নত করিয়া ধরিলেন এবং বাতিলকে—সত্যের বিরোধী দলের সমগ্র ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত করিয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পর আহমাদীয়া ও নেচারীয়া ফকীর সম্প্রদায়দ্বয়ের একটি যুক্ত প্রতিনিধি দল দামেশকের গবর্নরের দরবারে তাহাদের সম্পর্কে তিক্ত সমালোচনা করার কারণে ইমামের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উপস্থিত করিল। তিনি ইমামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম বলিলেন যে এই ফকীরদের দুইটি দল আছে; একটি দল নিজেদের পরহিজগারি, সাধুতা, সচ্চরিত্রতা ও দারিদ্রের কারণে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই ভণ্ড ফকীর। শির্‌ক, বিদয়াত ও কাফিরী ধারণার পঙ্কিলতায় ইহারা নিমজ্জিত! ইহারা কুরআন-হাদীস ইসলামের এই বুনিয়াদকে

পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা, প্রতারণা, কৌশল, ষড়যন্ত্র ও ধোঁকাবাজিকেই জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়া লইয়াছে। ইহারা দুনিয়াকে—দুনিয়ার মূর্খ মানুষ সাধারণকে ধোঁকা দিয়া, নানা প্রকার কুসংস্কারের জালে জড়িত করিয়া নিজেদের পকেট বোঝাই করিবার জন্য সদা-সর্বদা সাধুতার ভান্ করিয়া থাকে, নিজেদের চারিদিকে এমন একটি বিষাক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করিয়া লয় যে, যে-ই তাহাদের নিকট যায় সে-ই তাহাদের মানসিক গোলাম হইয়া বসে। নিজেদের পকেট উজাড় করিয়া ফকীরের পাদমূলে সর্বস্ব ঢালিয়া দেয়। ইমামের এই তীব্র অথচ প্রকৃত সত্য ভাষণ শুনিয়া গবর্নর আর কোন কথাই বলিলেন না।

কিন্তু অপরদিকে অতি গোপনে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে অন্যরূপ এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ইমামের চিরশত্রু শেখ নাসরুল মুঞ্জী দীর্ঘকাল ধরিয়া ইমামকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য প্রাণপণে কোশেশ করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না। অবশেষে মিসরের রাজন্যবর্গের নিকট এই মিথ্যা কথা প্রকাশ করিতে শুরু করিলেন যে, আসলে ইবনে তাইমিয়া একটা দল পাকাইয়া রাষ্ট্রক্ষমতা নিজের দলের লোকের হাতে তুলিয়া দিতে চাহেন। রাজপুরুষগণ এই কথা বাদশাহের গোচরীভূত করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া ক্রোধে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন! ৭০৫ হিজরীর রমযান মাসে ইবনে তাইমিয়াকে অবিলম্বে মিসর পাঠাইবার জন্য দামেশকের শাসনকর্তার প্রতি কড়া নির্দেশ পাঠাইলেন। গবর্নর দূতকে বলিলেন—"আমার সম্মুখে দুই দুইবার ইবনে তাইমিয়ার মতবাদের পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তাহা কুরআন-হাদীসের অনুরূপই পাওয়া গিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে মিসর পাঠান একেবারেই নিষ্প্রয়োজন !" কিন্তু ইহার জওয়াবে দূত বলিলেন, "যদি মঙ্গল চাও, তবে শাহী ফরমান অনুযায়ী কাজ করিতে বিলম্ব করিও না ! গভর্নর বাধ্য হইয়া ইবনে তাইমিয়াকে মিসরে প্রেরণ করিলেন।

৭০৫ হিজরীর ১২ই রমযান সোমবার ইমাম ইবনে তাইমিয়া দামেশ্‌ক হইতে নির্গত হইলেন। শহরের অধিবাসীদের একটি বিরাট দল ইমামের পিছনে পিছনে এক মঞ্জিল পথ অগ্রসর হইয়াছিল। ইমাম যখন ইহাদের ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে রওয়ানা হইলেন, তখন প্রত্যেকটি মানুষ প্রিয়জন বিচ্ছেদের দুঃসহ ব্যথায় আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ইমাম বিদায় হইয়া চলিয়া গেলে অপেক্ষমান জনতা দীর্ঘ সময় তাঁহার প্রতি অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকাইয়া রহিল। ১৭ই রমযান তিনি মিসরে উপনীত হইলেন। ইমামকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য জামে মসজিদে এক বিরাট সম্মেলন আহূত হইল। সকল মানুষই সেখানে ইমামের দীন ও মিল্লাতের নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত খিদমতের কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিল। অতঃপর ২২শে রমযান ইমাম কায়রো পৌঁছলেন। পরের দিন শুক্রবার কেল্লার অভ্যন্তরে ক্বাযীউল কুযাত ও রাজন্যবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ইমাম তাঁহার মতবাদ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন। কিন্তু ফেউ তাঁহার পিছনে লাগিয়াই ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে বহুবিধ মিথ্যা অভিযোগপূর্ণ অন্য আর একটি

দরখাস্ত বাদশাহের সমীপে পেশ করা হইল এবং এই মিথ্যা অভিযোগের ফলে ইমামকে বিনা বিচারে আটক রাখার ফয়সালা করা হয়। কিন্তু রাজ-পুরুষদের বহু আলোচনা-বিবেচনা ও সরকারী কর্মচারিদের বহু পরামর্শ ও তর্ক-বিতর্কের পর ৭০৭ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে ইমামকে মুক্তি দান করা হয়। মুক্তি পাইয়া ইমাম জামে' আল-হাকামের মসজিদে জুময়ার সালাত পড়াইলেন এবং সালাতের পর ৩/৪ ঘণ্টা ধরিয়া 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাসতাঈন' ("হে আল্লাহ! খাস করিয়া একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি এবং যাবতীয় দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একমাত্র তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি") এই বিষয় লইয়া এক দীর্ঘ তকরীর করেন।

এই সময় তিনি কিছুকাল মিসরে অবস্থান করিলেন এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবূল করার দিকে দাওয়াত দিতে লাগিলেন। প্রত্যেক জুময়ার সালাতের পর তিনি ওয়ায় করিতেন এবং ধীরে ধীরে ভ্রান্ত মতবাদের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিতে শুরু করিলেন। মুহীউদ্দীন বিন আরাবীর অদ্বৈতবাদের ভ্রান্তি তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণ করিলেন। কিন্তু এইসব ভ্রান্ত মতাবলম্বিগণ এই তীব্র সমালোচনার কষাঘাত সহ্য করিবে কেমন করিয়া! সূফী তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে তাহারা রাজকীয় দুর্গের পাদদেশে এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ইবনে তাইমিয়ার অবলম্বিত এই আচরণের মুকাবিলা করিবার জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করিল। অতঃপর আরো কতকগুলি অভিযোগের কারণে রাজ-সরকার দুইটি পন্থার যেকোন একটি কবুল করিবার জন্য ইমামকে আদেশ করিলেন—হয় কারাগারের অন্ধ কুঠরীতে যাইতে প্রস্তুত হইতে হইবে, অন্যথায়, নযরবন্দ হইয়া থাকিতে হইবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া কারাগারে গমন করাকেই পছন্দ করিলেন; কিন্তু বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত নযরবন্দ হইয়া থাকিতেই রাজী হইলেন। যদিও তাহার পরই তাঁহাকে মিসর হইতে নির্বাসিত করার আদেশ জারী করার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা ফিরাইয়া লওয়া হয় এবং সরকারের তরফ হইতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মোকদ্দমার শুনানীর পর শামসুদ্দীন সূফীকে জেলের ফরমান শুনাইবার জন্য আদেশ করা হয়। কিন্তু তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন যে, ইমামের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই, কাজেই আমি আত্মপ্রতারণা করিতে পারিব না। তাহার পর নূরউদ্দিন জাওয়াদীকে ক্ষমতা দেওয়া হইলে তিনিও নিরপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার মত জুলুমের কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন। এইসব দেখিয়া ইমাম সহাস্যে বলিলেন—"আমি কারাগারেই চলিয়া যাইতেছি, তোমরা এখানে বসিয়া যাহা ভালো মনে কর করিতে থাক।"

"হাব্‌সোল কুযাত" নামক কারাগারে তিনি বন্দীদিগকে পাইলেন জুয়া, শতরঞ্জ এবং অন্যান্য হীনতম খেল-তামাশায় নিমগ্ন; অপরাধ-বিজ্ঞানের এক মারাত্মক বাস্তব প্রকাশ দেখিতে পাইলেন সেখানে। বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না, আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক হইতেও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ইমাম তাহাদের এই মানবিক জীবন দেখিতে পাইয়া মর্মে মর্মে দুঃসহ ক্লেশ বোধ করিলেন।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, বিশ্ব-প্রকৃতিকে জয় করিয়া তাহার মর্মমূলে প্রবেশ করা এবং একমাত্র আল্লাহ্র সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই মানুষগুলি পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মানবোচিত কোন চরিত্রই তাহাদের মধ্যে ছিল না। ইমাম তাঁহার কর্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিলেন—এই "পশু"গুলিকে মনষ্যত্বের সুমহান মর্যাদায় উন্নীত করিতে হইবে, সত্যের ভুলিয়া যাওয়া সবক আবার ইহাদের শিখাইতে হইবে, আল্লাহ্র সহিত ইহাদের সম্পর্ক সংস্থাপন করিয়া দিতে হইবে।

ইমাম দৃঢ়সংকল্প হইয়া ধীরে ধীরে কাজ শুরু করিলেন। বন্দীদিগকে প্রথমে সালাত পড়ার প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বস্তুত ঠিকমত সালাত পড়িতে পারিলে ইহাই মানুষকে সমস্ত অপরাধ ও পাপ-পঙ্কিলতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত সচ্চরিত্রতা, নেক-কাজ, মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের মর্মকথা তাহাদের শিখাইতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা, তাঁহার আদেশ ও নিষেধগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা, মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহ্র বিধান মত পরিচালিত করা প্রভৃতি শাশ্বত সত্যগুলি বন্দীদের হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে লাগিলেন এবং কুরআন ও হাদীস পড়াইয়া রীতিমত শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। এইভাবে অল্প কিছুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জেলখানার সংকীর্ণ পরিবেশে—সেই অপরাধ-তত্ত্বের লীলাক্ষেত্রে—জেলখানার পাশবিক জীবনের সেই অন্ধকার সমাচ্ছন্ন জিন্দানখানায় মনুষ্যত্বের ও ধার্মিকতার নূতন আলো ফুটিয়া উঠিল। দৈনন্দিন জীবনের পাপানুষ্ঠান পূর্বের ন্যায় আর রহিল না। বন্দীরা পাইল মনুষ্যত্বের অনাস্বাদিত স্বাদ। জেলখানা হইয়া গেল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মনীতি শিক্ষার পাদপীঠ। এইরূপে ইমাম জেলখানায় হযরত ইউসুফের সুন্নত পুরাপুরিই পালন করিয়াছিলেন।

জেলের মধ্যে ইমামের নিকট লোকজন দিনরাত জড় হইয়া থাকিত। নানা প্রকার প্রশ্নের জওয়াব তিনি লিখিয়া দিতেন। আমীর-ওমরাহ ও রাজন্যবর্গের ধর্ম সম্পর্কীয় যাবতীয় সমস্যা তিনিই সমাধান করিয়া দিতেন। মোটকথা, নির্বিশেষে সকল মানুষই তাঁহার সাহচর্যে অপূর্ব উপকার লাভ করিত। কিন্তু এতসব হইতেছিল ইমামের শত্রুমণ্ডলীর একেবার অজ্ঞাতে। তাহারা যখনই এইরূপ অভাবিতপূর্ব কাণ্ড দেখিতে পাইল, অমনি তাঁহাকে আলেকজান্দ্রিয়ার জেলে স্থানান্তরিত করিয়া দিল। অসংখ্য কয়েদী তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ইমাম তাহা মঞ্জুর করিলেন না। আলেকজান্দ্রিয়ার এক দুর্গে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। এইখানে তিনি দীর্ঘ আঠারো মাস আটক রহিলেন। এই মুদ্দতের মধ্যে ইমামের মৃত্যুসংবাদ বহির্জগতে বারবার ছড়াইয়াছে, আর মুসলিম দুনিয়ার মানুষ বারবার কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে।

৭০৯ হিজরীতে বাদশাহের নির্দেশক্রমে ইমামকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাইয়াই তিনি কায়রো চলিয়া যান। তাঁহার পিছনে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীদের এক বিরাট

মিছিল বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। সমবেতভাবে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে তাহারা আল্লাহ্র দরবারে এই আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিল—"আল্লাহ্! ইমাম যেন আবার আমাদের নিকট ফিরিয়া আসেন !"

কায়রোয় ইমাম ইবনে তাইমিয়া "মাশহাদুল" নামক স্থানের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক জাহবী বলেন যে, অতঃপর ইমাম পুনরায় অধ্যাপনা, কুরআন-হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান করিতে শুরু করিলেন। অপরদিকে সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকগণ ইমামের নিকট নানা প্রকার মসলা-মাসায়েল ও ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। শত্রুশ্রেণীর লোকগণ শত্রুতা ও বিরোধিতা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাহিল। এইভাবে কিছুদিন পর্যন্ত তিনি নির্বিঘ্নে ইজতিহাদ ও ধর্মপ্রচার কাজে নিমগ্ন রহিলেন। কিন্তু সহসা অভাবিতপূর্ব এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। ৭১১ হিজরীর রজব মাসে মিসরের জামে' মসজিদে বিরোধী পার্টি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং একটি নির্জন ঘরে বন্দী করিয়া তাঁহাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। এই দুঃসংবাদ যখন শহরের চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন অসংখ্য লোক ও সৈনিক আসিয়া সমবেত হইল। উত্তেজিত জনতা ইমামের নিকট এই অমার্জনীয় অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি চাহিল। বলিল— "আদেশ করিলে আমরা সমগ্র মিসরকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিব।" জওয়াবে ইমাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সব তোমরা কেন করিতে চাও ?" বিক্ষুব্ধ জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"আপনার জন্য।" ইমাম বলিলেন, "আমি আমার নিজের জন্য এই ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করা আদৌ পছন্দ করি না, ইহা আল্লাহ্র বিধানে একেবারে নিষিদ্ধ। তাহারা আমার নিকট অপরাধ করিয়াছে, আমি তাহাদের ক্ষমা করিলাম।"

অতঃপর অনেকদিন পর্যন্ত ইমাম মিসরে অবস্থান করিলেন। তারপর সরকারী পুলিশের পাহারায় বায়তুল মুকাদ্দাস হইয়া দামেশকে রওয়ানা হইলেন। দীর্ঘ সাত বৎসর পর ৭১২ হিজরীতে ইমাম নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। একটি বিরাট জামায়াত তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য অগ্রসর হইল। ঘরে ঘরে এই দিন আনন্দের উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইমাম দামেশকে পৌঁছিয়া ইল্ম-প্রচার, ফতওয়া প্রদান, গ্রন্থ-প্রণয়ন ও মানব-সেবার বহুবিধ কাজে ব্যতিব্যস্ত রহিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কুরআন ও হাদীস মন্থন করিয়া বহুবিধ জটিল ও অমীমাংসিতপূর্ব বিষয়ের সুন্দরতম সমাধান বাহির করার আশ্চর্য রকম ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে কোথায়ও অন্ধভাবে অন্যের অনুসরণ বা অনুকরণ করিতে হয় নাই। তৎকালীন আলিমগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া বাদশাহের মোসাহেব ও আদেশানুবর্তী দাস হইয়াছিলেন মাত্র, বাদশাহের ইচ্ছানুরূপ ফতওয়া প্রচারই ছিল তাঁহাদের একমাত্র কাজ! ফলে বহু বিদয়াত ও কুসংস্কার এবং বহু পাপানুষ্ঠান, বহু গায়র-

ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়া যখন অনাবিল স্বচ্ছ ও স্পষ্ট নির্ভীক দৃষ্টিতে একমাত্র কুরআন ও হাদীসের মর্মমূলে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন বাহির দুনিয়ায় গাঢ় তমসা, মানুষের সৃষ্ট বহু ভ্রান্ত মতবাদ, বহু ইচ্ছাকৃত ভুল এবং বহু পাপানুষ্ঠানকেও "ধর্মকাজ" বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার কাফিরী ও শয়তানী প্রচেষ্টা! কাজেই তিনি প্রকৃত সত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। বহু বিশ্বাস ও মতবাদের ভ্রান্তি অপনোদনে বহু কুসংস্কারপন্থী আক্রোশে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। প্রতি পদে পদে ইমামকে বাধা দেওয়া, নির্যাতন ও উৎপীড়নে জর্জরিত করিয়া তোলা এবং মিথ্যা ষড়যন্ত্র করিয়া ইমামকে কারারুদ্ধ করিবার হীন প্রচেষ্টায় তাহারা নতুন করিয়া আত্মনিয়োগ করিল! ৭১৮ হিজরীতে আবার তাহারা রাজদরবারে অভিযোগ জানাইল। ফলে সরকারের তরফ হইতে এই নিষেধাজ্ঞা জারী হইল যে, অতঃপর ইমাম আর কোন বিষয়ে ফতোয়া প্রচার করিতে পারিবেন না ! কিন্তু সত্য প্রচারের দুঃসাহসিক দায়িত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন ইবনে তাইমিয়া। তিনি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিলেন ঃ 'সত্য গোপন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না'। রাজাদেশের এই বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাঁকে মুচলেকা দিতে বলিলে ইমাম তাঁহার কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ভীত ও কুণ্ঠিত হইলেন না! অতঃপর ৭২০ হিজরীতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া-সমস্যার একটা চূড়ান্ত সমাধান করিবার জন্য "দারুস্‌সায়াদাত"-এ বিচারকদের এক বৈঠক বসিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে রাজাদেশ বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে ইমামকে বন্দী করার ফরমান জারী হইল। এই সময়ে ইমাম পাঁচমাস আঠারো দিন পর্যন্ত কেল্লায় বন্দী হইয়া রহিলেন।

৭২১ হিজরীতে সরকারী নির্দেশক্রমে ইমামকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পাইয়া ইমাম আবার ব্যাপকভাবে জ্ঞান-প্রচারের কাজে নিমগ্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন বহু অলী-দরবেশের কবর পূজারীদের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। দূর দূর দেশ হইতে হাজার হাজার লোক তাহাদের কবর জিয়ারত করিবার জন্য এবং সমাধিস্থ মৃতপীরের ফায়েজ লইবার উদ্দেশ্যে অন্ধ ও উন্মত্ত পরোয়ানার ন্যায় দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে। একদিকে মূর্খতা, অন্যদিকে বেদান্তবাদী তাসাউফ তৎকালীন আলিম সমাজকেও এই কবর পূজার দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। মোটকথা হিন্দু-পৌত্তলিকগণ একটা দেবমূর্তির সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করে, তৎকালীন মূর্খ ও অন্ধ মানুষও পীর-দরবেশদের কবরের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিত। এই সময় ৭২৬ সনে ইমাম ইবনে তাইমিয়া "কবর জিয়ারত করিবার জন্য দূর দেশে সফর করা জায়েয নয়" বলিয়া কুরআন ও হাদীসের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত একখানি ফতোয়া প্রচার করেন। এই ফতোয়া প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র দেশব্যাপী তুমুল হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, ভীমরুলের বাসায় ঢিল ছুঁড়িলে যে ফল হয়, এই ফতোয়া দ্বারাও ইমামকে সেই

পরিণতিই ভোগ করিতে হইল। চারিদিকে বিদ্রোহ ও শত্রুতার দাবানল দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শত্রুতার প্রচণ্ডতা দেখিতে পাইয়া ইমামের বহু সাহায্যকারী ও স্বপক্ষীয় লোক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। শেষ পর্যন্তও যাহারা তাঁহার সমর্থক হইয়াছিল, তাহারও ভীত ও শংকিত হইয়া রহিল। কিন্তু নিদারুণ বিষাদ ও কঠিন ভাগ্য-বিপর্যয়ের কালেও ইমাম ধীরতা ও গাম্ভীর্যের সহিত ক্রমবিবর্তিত ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় বিরোধী দল ইমামের এই ধৃষ্টতা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিবার মানসে একটি সভা আহ্বান করিল। তাহাতে বহু আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক এবং নানা প্রকারের অভিমত প্রকাশ করা হইল। কেহ বলিল, ইমামকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ; কেহ মত দিল, ইমামের জিহ্বা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আর একজন বলিল, ইমামকে চাবুক মারিতে হইবে। অন্য একজন মত প্রকাশ করিল, ইমামকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অপর একটি দল বাদশাহের দরবারে অভিযোগ পেশ করিল এবং ইমামকে হত্যা করিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু রাজদরবারে সে প্রস্তাব গৃহীত হইল না। তবে বাদশাহ এই অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর ৭২৬ হিজরীতে রাজদূত ইবনে তাইমিয়াকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা লইয়া হাজির হইল। ইমাম এই ফরমান পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন— "আমি ইহারই প্রতীক্ষায় ছিলাম, ইহাতেই আমার জন্য প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে।" এই বলিয়া তিনি সরকারী অশ্বে আরোহণ করত কেল্লার দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। কেল্লার একদিকের কামরায় তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার অন্যান্য সাহায্যকারীদেরও বন্দী করা হইল, অনেককে দেওয়া হইল তীক্ষ্ণ চাবুকের নির্মম আঘাত।

ওদিকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ বাগদাদ নগরে যখন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া গিয়া পৌঁছিল, তখন তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ আলিমগণ একবাক্যে ইমামের ফতওয়ার সত্যতা সমর্থন করিলেন এবং তাহা যে বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিযুক্ত ও ইসলামের মূল ভাবধারার অনুরূপ, তাহা পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়া পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের তরফ হইতে বাদশাহের উদ্দেশ্যে যে দুইখানি চিঠি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"... পৃথিবীর বুকে আজ একটিমাত্র রাষ্ট্র বিদ্যমান, যাহার উপর খুন-খারাবী ও অবিচার উৎপীড়নের কোনই কলঙ্ক নাই এবং এই রাষ্ট্রেই ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত যুগশ্রেষ্ঠ, শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার রাহ্‌বর ও ইমাম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বের সপ্ত-রাজ্য, সাময়িক সমস্ত রাজ্যের ধনভাণ্ডারেও তাঁহার মূল্য দিতে পারে না। কি আশ্চর্য, জাতির তরণীর এই কর্ণধার রাজ-প্রাসাদবাসী হওয়ার পরিবর্তে আজ কেল্লার অন্ধকার কুঠরীতে বন্দীর জীবন যাপন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি ভিত্তিহীন দোষারোপ করা হইতেছে !

"বাদশাহের আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না, কারণ ইবনে তাইমিয়া এ যুগের ইউসুফ নবী। কিন্‌য়ানবাসিগণ যেমন দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত হইয়া হযরত ইউসুফের নিকট আসিয়াছিল ভিক্ষার জন্য, ঠিক তেমনি আজ বিশ্ব-মানুষের নিখিল আত্মা ন্যায় ও সত্যের দুর্ভিক্ষে একেবারে উজাড় ও সর্বহারা হইয়া গিয়াছে। ইবনে তাইমিয়ার নিকটেই আছে এমন এক খাদ্য ও পানীয়, যাহা সমস্ত মানুষের ক্ষুধিত পিপাসার্ত প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে! সমগ্র পৃথিবীর বুকে এখন এমন কোন ব্যক্তিত্বই নাই, যাহার নিকট নিখিল মানবাত্মার তীব্র জ্ঞান-পিপাসা দূর করার মত পানীয় থাকিতে পারে। সারা দুনিয়া প্রতীক্ষমাণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে শুধু ইবনে তাইমিয়ার দিকে! বাদশাহ যদি এই মহা সম্মানিত ইমামকে বন্দীদশার কঠোরতা হইতে আজাদ করিয়া দেন, তবে মানবতার প্রতি ইহা হইবে তাহার অপরিসীম অনুগ্রহ। ...

"ইরাক অধিবাসিগণ যখন শেয়খুল ইসলামের এই সব দুঃখকষ্টের কথা জানিতে পারিয়াছিল, তখন সারা দেশটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক দুঃসহ অন্তর্বেদনার উত্তাল প্লাবন বহিয়া গেল। প্রত্যেকটি ঘর হইতে জাগিয়া উঠিল মর্মবিদারী ফরিয়াদ! কিন্তু বিদয়াতপন্থী ও শত্রুদের ঘরে ঘরে সেদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল হিংস্র-কুটিল শয়তানী উৎসব। বস্তুত ইমামের এই দুর্ভোগের একমাত্র কারণ হইতেছে তাঁহারই দেওয়া ফতওয়া। এইজন্য বাগদাদ ও ইরাকের সমস্ত আলিমের সম্মিলিত ফয়সালা আপনাকে ... মিসর অধিপতিকে জানাইয়া দেওয়া হইল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীত সত্য। শেয়খুল ইসলামকে ইসলামের খেদমতের জন্য মুক্ত করিয়া দিলে বিশ্ব-মুসলিমের প্রতি তাহা হইবে বিশেষ অনুগ্রহের কাজ।"

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাগদাদের শ্রেষ্ঠ আলিমদের এই সম্মিলিত চিঠি মিসর রাজের সম্মুখে গিয়া হয়তবা মাত্রই পৌঁছায় নাই; কিংবা পৌঁছিলেও তাহা এমন সময় পৌঁছিয়াছে, যখন "শতাব্দীর সূর্য" নিখিল দুনিয়াকে নিঃসীম অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। কাজেই এই সব চিঠি-পত্র কোন ফলই দিতে পারিল না। ইমাম পূর্বানুরূপ কারাগারে বন্দী হইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ইমামের সহোদর ভাই শরফুদ্দীন ইহদুনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন অমর-লোকের চিরশান্তির রাজ্যে। এই সংবাদ ইমামকে গভীর শোকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সময় ইমাম জিন্দানখানার অন্তরালে রাত্র দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন ইবাদত বন্দেগী ও কুরআন তিলাওয়াতের পুণ্যময় কাজে।

জীবন-সায়াহ্নে

এইবার ইমাম দীর্ঘ তিন বৎসর ও তিন মাস কালেরও বেশী দিন কারারুদ্ধ ছিলেন জিন্দানখানার এই নিষ্ঠুর বন্দীজীবনও তাঁহার কাটিয়াছে অসংখ্য মৌলিক ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনায়, বিরোধী মতাবলম্বীদের প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করার অশ্রান্ত কর্মের ভিতর দিয়া। শুধু কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূরদেশ যাত্রা করার প্রথার প্রতিবাদ করিয়া তিনি কয়েক খণ্ড

কিতাব রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন কোন কিতাব কারাগারের প্রাচীর উল্লংঘন করিয়া বিশ্বের চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বিরোধী দলের লোক ইহাও বরদাশত করিতে পারিল না। ফলে ইমামের জীবন-প্রদীপ চির নির্বাণ লাভ করিবার কিছু দিন পূর্বে বাদশাহের ফরমান অনুযায়ী ইমামকে কাগজ, কলম, কালি এবং গ্রন্থাবলী হইতেও একেবার বঞ্চিত করা হইল। কিন্তু তীব্র উদ্বেলিত জলস্রোত বাধা মানিয়াছিল কবে যে, ইমামের উদ্দাম লেখনীধারা কাগজ কলমের অভাবে সামান্য বাঁধের নিকটে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে? বাধাগ্রস্ত জলপ্লাবন যেমন যেকোন প্রকারেই হউক নিজের গতিপথ আবিষ্কার করিয়া লয়, অনুরূপভাবে ইমামের লেখনীও এই বাধা মাত্রই মানিল না, থামিয়া গেল না এই দুশমনের ভ্রূকুটির সম্মুখে। ইমাম অতঃপর কয়লা ব্যবহার করিতে লাগিলেন মসি-লেখনীর পরিবর্তে! কয়লা দিয়াই তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে যে কয়টি কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিদায়ী সূর্যের শ্রান্তোজ্জ্বল শেষরশ্মি, তাহা নিপীড়িত ব্যথিত মানবাত্মার সর্বশেষ সত্য ভাষণ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কয়লা দ্বারা দুই পিঠে লিখিত যে কাগজখানা পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথম পৃষ্ঠা

"আমি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে খুবই সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ যাহা কিছু করেন ইসলামের মঙ্গলের জন্য করেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিয়ামত। তিনি তাঁহার রাসূলকে তাঁহার তওহীদ বাণী প্রচার করিবার জন্যই পাঠাইয়াছিলেন, আর শয়তান আবহমানকাল হইতে তাহার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইসলামের গৌরব নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। প্রথম দিন হইতে আল্লাহ্র এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে যে, তিনি সত্যের সাহায্যের জন্য এমন সব লোক নির্বাচিত করেন, যাঁহারা বাতিল মতবাদ ও গায়র ইসলামী আকিদাহ-আখলাকের কেন্দ্রগুলির উপর অগ্নিবর্ষণ করেন। ইবলীস শুধু দীন-ইসলামেরই শত্রুতা করে নাই, সমগ্র ধর্ম ও সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের যাত্রাপথেই সৃষ্টি করিয়াছে নানা প্রকার বাধা ও বিপত্তি।

"আমার উপর বিরোধিগণ নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের লাঞ্ছিত করিয়াছেন। আমাকে "বিদআতী" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অথচ আসল ব্যাপার ঠিক ইহার বিপরীত। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান লাভ করার পর শুধু সেই ব্যক্তিই "বিদয়াতী" থাকিতে পারে, পাশবিক লালসার উৎকট তাড়না যাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং যে শুধু মানুষের নফ্সের খাহেশাতের পূজারী হইয়া গিয়াছে ...। আল্লাহ্র হাজার শোকর, তিনি আমাকে জিহাদ করিবার সুযোগ দিয়াছেন এবং আমি সাধ্যানুসারে বাতিলের কেল্লা চূর্ণ করিয়া দিয়াছি।"

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

"... আমার নিকট হইতে আমার রচিত কিতাবগুলিও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার খাস রহমত বিশেষ। কারণ এই উপায়েই দুনিয়ার মানুষ আমার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া সত্যের সন্ধান লাভ করিবার সুযোগ পাইবে। আমার লিখিত গ্রন্থাবলীতে আমি কতগুলি এমন জটিল বিষয়ের সুচিন্তিত মীমাংসা করিয়া দিয়াছি, যাহা আজ পর্যন্তও ছিল একেবারে অজ্ঞাত। আমি এই কিতাবগুলি বাক্সবন্ধ কিংবা গোপন করিয়া রাখিবার জন্য লিখি নাই, লিখিয়াছি এইজন্য যে, দুনিয়াবাসী তাহা পড়িবে এবং উহার সত্যবাণী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে,—ইহাও তাবলীগ ও ইসলাম প্রচারের একটি উপায়। আল্লাহ্ যাহা কিছু করেন, মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেন। মানুষের উপকার হইলে শোকর করিবে, ক্ষতি হইলে ধৈর্য ধারণ করিবে। ফলে উভয় অবস্থাতেই সে পুণ্যের অধিকারী হইবে।"

সম্ভবত ইহা ইমামের দেড় মাস পূর্বের লেখা। কাগজ কলম হইতে বঞ্চিত হইয়া ইমাম নিবিড়ভাবে ডুবিয়া গেলেন ইবাদত বন্দেগী ও কুরআন তিলাওয়াতের পুণ্যময় কাজে। প্রতি দশ দিনেই তিনি কুরআন খতম করিতেন। তাঁহার ইসলাম প্রচারের গুরুদায়িত্ব শেষ হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার পয়গাম ইসলাম জগতের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাঁহার উৎপীড়িত আত্মা ইহজগত হইতে বিদায় লইবার জন্য কাতর হইয়া উঠিল। বিশ দিনের কিছু বেশী সময়কাল কেল্লার অভ্যন্তরে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকিয়া ৭২৮ হিজরীর (১৩২৭ খৃ.) ২০শে জিলক্বাদ ইমাম ইবনে তাইমিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া অমর ধামে যাত্রা করেন। (ইন্নালিল্লাহি ...)।

জীবন শেষে

সপ্তম হিজরীর মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনে তাইময়ার জীবন নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহকারে এবং কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরেই অতিক্রান্ত হইয়াছে। ৭০৫ হইতে ৭২৭ হিজরী, অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ক্রমাগতভাবে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র, বিবাদ বিসম্বাদ, বিতর্ক-বিপর্যয় এবং শত্রুদের প্রবল শত্রুতায় আক্রান্ত হইয়া একেবারে জর্জরিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কেল্লার মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিতে হইয়াছে, তাঁহাকে 'কাফির' বলিয়া ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে, সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিবার জন্য অসংখ্য বিপদ-বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করা হইয়াছে। দিবালোকেই ইমামের উপর অমানুষিক আক্রমণ চালান হইয়াছে। এমন কি, পৃথিবীর কোটি মানুষকে সত্য-জ্ঞানের নির্মল আলোকধারা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ইমামের নিকট হইতে কাগজ কলম কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসহ দুর্ভোগ, এই অমানুষিক লাঞ্ছনা, অবমাননা, এই নির্মম নির্যাতন ও কারাবন্ধন ... পৃথিবীর "তাজদীদ ও ইসলাহ"—সত্যবাণীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টার সুদীর্ঘ রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাসে ইহা কোন নূতন ঘটনা নহে, অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিতও কিছু নহে। প্রত্যেক জাতি ও মিল্লাত এবং প্রত্যেক

দেশের বিপ্লবীর জীবনই এই ধরনের দুর্ঘটনায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম মূসা কাজেম, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ বকর নাবলেসী, শেয়খ আজউদ্দীন সায়ফী, হযরত মালিক বিন আনাস, হযরত সায়ীদ বিন মুসাইয়েব, খাজা কুতুবুদ্দীন কাকী, শেয়খ জামালুদ্দীন দেহলভী এবং শেয়খ আহমাদ সেরহন্দী—ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের এই সব সত্যের সৈনিকদের সংগ্রামময় জীবন কাহিনী বহু উৎপীড়ন ও নির্যাতনের রক্তরেখায় রক্তিম ও করুণ হইয়া রহিয়াছে। আঘাতের পর আঘাতে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবন-পাত্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জুলুম ও দুশমনির তীক্ষ্ণ কৃপাণের তলে অথবা নিরন্তর অপমান নির্যাতনের নির্মম শীলাপেষণের তলে পড়িয়া ইঁহারা তিল তিল করিয়া নিঃশেষে আত্মদান করিয়াছেন। ... ইহা স্বাভাবিক, ইহা চিরন্তন। কিন্তু দুঃখ দুর্ভোগ্যের এই সর্বগ্রাসী সয়লাব-স্রোতের সম্মুখে আল-বোর্জের গিরিচূড়ার মতই তাঁহারা মস্তক উন্নত করিয়া একেবারে অচল অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সত্যের জন্য জন্ম হইয়াছিল ইঁহাদের, সত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ও সত্যের বিজয় কেতন দূর শূন্যলোকে উড্ডীন করিবার অক্লান্ত সাধনায়ই তাঁহারা নিমগ্ন রহিয়াছেন আজীবন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইহার কোন অসতর্ক মুহূর্তেও সত্যকে পরিহার করেন নাই।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ওফাতের মর্মবিদারী সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়িল। মসজিদ ও মিনারার চূড়া হইতে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। চারিদিক হইতে কলিজা-ফাটা কান্নার দুঃসহ আওয়াজ বুলন্দ হইয়া উঠিল। শহরের দোকানপাট বন্ধ হইয়া গেল, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই কেল্লার দ্বারদেশে ভীড় জমাইল। জামে দামেশকে তিল ধারণের স্থান ছিল না।এখানেই তাঁহার জানাযার নামায পড়া হয়। জানাযায় প্রায় দুই লক্ষ লোক যোগদান করিয়াছিলেন এবং "সোফিয়া" কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। কবরস্থানের দিকে লাশ লইয়া যাওয়ার সময় শহরের পঁচাত্তর হাজার নারী নিজ নিজ বাড়ির ছাদে উঠিয়া শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, দুই লক্ষাধিক পুরুষের উদ্বেলিত তুফান ইসলামের এই বীর মুজাহিদকে চিরদিনের তরে রুখসত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে। অসংখ্য মানুষের ব্যথিত চিত্তের মর্মবিদারী হাহাকার আকাশ বাতাস মথিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় মসজিদের মিনার হইতে ঘোষণা করা হয় "ইসলাম-পালনকারীদের জানাযা এমনিই হইয়া থাকে।" চারিদিন পরে কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী চীনদেশ হইতে আওয়াজ উঠিল "মুসলমান, কুরআন ব্যাখ্যাকারীর জানাযা পড়।"

ইবনে তাইমিয়ার মিশন ও লক্ষ্য

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামশীল জীবনের মিশন ও মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি প্রধান কর্তব্য সম্পাদন করা। প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার দীন প্রচার করা, দ্বিতীয়ত দুনিয়ার বুক

হইতে সর্বপ্রকার ইসলাম-বিরোধী মতবাদ ও আকিদা-আখলাক দূর করিয়া দিয়া নামধারী মুসলিমদের খাঁটি মুসলমান করিয়া তোলা এবং তৃতীয়ত সর্বশেষ শক্তি নিয়োজিত করিয়া বিশ্ব-মুসলিম জাতিকে জালিমের জুলুম ও নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করা।

বস্তুত ইবনে তাইমিয়ার দীর্ঘ কর্মময় জীবন এই তিনটি প্রধান কাজেই অতিবাহিত হইয়াছে ! তিনি তৎকালীন মুসলিম-দুনিয়ার সমস্ত গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট দলসমূহের ভ্রান্তি প্রমাণ করিয়াছেন, নির্ভীক কণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাসাউফ-পন্থীদের বিভ্রান্তকারী মতবাদ তিনি বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রচারিত প্রকৃত ইসলাম নূতন করিয়া তিনি প্রচার করিয়াছেন লেখনী ও বক্তৃতার সাহায্যে। পীর-পূজা, কবর-পূজা, অবতারবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বাতিল আকিদাগুলির বলিষ্ঠ ভাষায় প্রতিবাদ করিয়া তিনি রচনা করিয়াছেন অগণিত মূল্যবান গ্রন্থ। ইসলামী রাজনীতির ব্যাখ্যা করিয়া তদানীন্তন মুসলিম রাজন্যবর্গের সঠিক ও কল্যাণকর পথের নির্দেশ দিয়াছেন এবং সর্বোপরি কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ তফসীর লিখিয়া ইসলামকে এক অক্ষয় ভিত্তিতে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার বিরাট দায়িত্ব তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি ইসলামী আখলাকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হাদীস সম্পর্কে বহু সারগর্ভ রচনাও তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়া সত্যান্বেষীদের মন ও মগজ জয় করিয়াছে। বাতিল খেয়ালাতের প্রতিবাদ করিয়া অসংখ্য বিপ্লবী ফতওয়া প্রচার করিয়া মানুষের ধাঁধাঁ ভঞ্জন করিয়াছেন। এই সবের দরুনই তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছিল এত দুঃখ-লাঞ্ছনা, এত নির্বাসন ও কারাবরণ।

লেখনী চালনা করিয়া অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইসলাম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই তিনি। নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া, আমল আখলাকের দিক দিয়াও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। নবীর সুন্নত পালনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পৃথিবীর আদর্শ পুরুষ। সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাধনা ও প্রচেষ্টার ব্যাপারে তাঁহার সাহস ও হিম্মৎ ছিল অতীব বিস্ময়কর ! তাঁহার সংগ্রাম-রুক্ষ জীবনে এমন সব বন্ধুর ক্ষেত্র ও সংকটময় মুহূর্ত বারবার আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহার বিভীষিকা বড় বড় বীর সৈনিকদেরও কম্পিত ও আদর্শবিচ্যুত করিয়া দিতে পারে অনায়াসে। আর যাহারা সামান্য বাহানার সুযোগ লইয়া কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করে না . . . পিছন হইতে অজ্ঞাতসারে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে প্রাণপণে, ইবনে তাইমিয়ার জীবনে এই ধরনের কঠিন সংকটময় মুহূর্তগুলিতে তাহারা কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহার কিছুই ঠিকানা ছিল না। কিন্তু ইমাম ইবনে তাইমিয়ার "আল্লাহ্‌র পথে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করার" আহ্বানের মূলে কোন বাহানা কোন প্রতারণাই ছিল না, ছিল না অন্যের সাথে বিন্দুমাত্র সমঝোতা। দুর্বলতা, কাপুরুষতা ও সুবিধাবাদকে তিনি ঘৃণার সহিত দুই পায়ে দলিয়া গিয়াছেন। যেমন উচ্চ পর্বতচূড়া হইতে খরস্রোতা ঝর্ণাধারা চড়াই-উতরাইয়ের তিলমাত্র পরোয়া না করিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলে এবং সমস্ত বাধা বন্ধন অতিক্রম করিয়া যায় সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া, ঠিক তদ্রূপ ইমাম

ইবনে তাইমিয়ার সত্য-প্রেমের প্রবল বন্যা-প্লাবন আজীবন অবিসংবাদিতভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। কুরআন হাদীসের নির্ধারিত সীমাসরহদের মধ্যে বিন্দুমাত্র বাধা তিনি কখনই স্বীকার করেন নাই। বরং দুরন্ত সাহসের উপর ভর করিয়া উহার সহিত মোকাবিলা করিয়াছেন এবং সমস্ত বাধাবিপত্তি চূর্ণ করিয়া নিজের চলার পথ সুগম করিয়া লইয়াছেন। ইমাম ছিলেন সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ, সাধারণ বিদ্বান লোকের ন্যায় শুধু মুখ ও লেখনী পরিচালনা বা বক্তৃতা ও গ্রন্থরচনা করার সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হইয়া ছিল না তাঁহার জিহাদ! ইসলামের যুদ্ধনীতি অনুসারে ইসলামের মহান সত্য প্রচার করার পর প্রয়োজনবোধে তরবারি দ্বারাও তিনি জিহাদ করিয়াছেন! এইভাবে বহু অতুলনীয় গুণবৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ব্যক্তিত্বে। ঠিক এই কারণেই তৎকালীন মনীষী শেয়খ ইমামুদ্দীন ওয়াসতির মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল—"আজ আকাশের তলে ইবনে তাইমিয়ার সমতুল্য আর কাহাকেও দেখা যায় না! না ইলমের দিক দিয়া, আর না তদনুযায়ী আমল করার দিক দিয়া! আল্লাহ্‌র শপথ, কাহারো কথা ও কাজের মধ্য হইতে নবুয়াতে মুহাম্মদীর নির্মল আলোক-জ্যোতি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়, যাহাকে দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলিতে পারি ইহাকেই বলে নবীর সত্যকার অনুসরণ, তবে তিনি ইবনে তাইমিয়া ভিন্ন আর কেহই নহে!"

ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী নু'মানী ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন—"মুজাদ্দিদ হইবার যতগুলি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সুন্দর সমাবেশ ইবনে তাইমিয়ার ব্যক্তি-সত্তায় সম্ভব হইয়াছে, তাহার তুলনা দুর্লভ এবং "শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক" উপাধি একমাত্র তাঁহাতেই শোভা পায়।"

দুর্ধর্ষ তাতার সৈনিকগণ দামেশকের উপর আক্রমণ করিল। আক্রমণের তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা দেখিয়া মিসর রাজের সমস্ত সৈনিকই যুদ্ধ-ময়দান হইতে পলায়ন করিয়া গেল! ইহাতে সর্বসাধারণ মানুষের মন হতাশা ও নৈরাশ্যের দুর্বহভারে ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিকে অশান্তি ও বিশৃংখলার রাজত্ব চলিতেছিল। ইবনে তাইমিয়া দেখিলেন এই কঠিন সংকট মুহূর্তে মুসলমান যদি একত্রিত হইয়া তাতারী আক্রমণের সয়লাব-স্রোতের সম্মুখে দুর্লংঘ পর্বতের ন্যায় মাথা উঁচু করিয়া না দাঁড়ায়, তবে মুসলিম মিল্লাত ও সভ্যতা চিরতরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইমাম সোজাসুজি মিসররাজের দরবারে চলিয়া গেলেন। রাজ্যের সকল আমির-ওমরাহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইঁহাদের সম্মুখে মুসলিম সৈন্যদের পলায়নের জন্য তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিলে এবং পুনরায় তাতারদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে জিহাদ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্বসাধারণ মুসলমানদের নামে তিনি একখানি খোলা চিঠি প্রকাশ করিলেন। কুরআন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই চিঠিতে প্রমাণ করিলেন যে মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'আলাকে একেবারে ভুলিয়া বসে, তখন আল্লাহ্ তাহাদের উপর নানাপ্রকার বালা-মুসিবত নাজিল করিয়া তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদন করেন, বিলীয়মান চেতনা জাগাইয়া দেন। মুসলিম রাজ্যগুলির

উপর সাম্প্রতিক প্রলয়ংকর আক্রমণও আসিয়াছে মুসলিম জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ ও আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাওয়ার কারণে! যেসব কঠিন মুহূর্তে নবী মুস্তফা (সা)-এর প্রতি কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, সেই বিশেষ মুহূর্তই এখন উপস্থিত হইয়াছে; সারা মুসলিম দুনিয়ার উপর চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত করিবার সময় আসিয়াছে আজ,—মুসলমান চিরতরে ধ্বংস হইতে চায়, না দীন ও ঈমান রক্ষা করিবার জন্য তাহারা জিহাদ করিতে প্রস্তুত ? তিনি লিখিলেন—এখন ইসলামের উপর একটা বিরাট ও ভয়ানক মুসিবত নাজিল হইয়াছে, ইহার বিদূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা যদি এখন না করা হয়, তবে ঈমান ও ইসলামের বুনিয়াদ চূর্ণ হইবে, ইসলামের অবশিষ্ট শক্তিসমূহ চিরতরে বিলীন হইয়া যাইবে এবং তাতারীদের উদ্দাম জুলুম-সেতমে দীন ও ধর্মের নাম পর্যন্ত মিটিয়া যাইবে। এই ফেতনা এত ভয়ানক ও বিভীষিকাময় যে বৈজ্ঞানিকেরা হয়রান, ধার্মিক মানুষ ভীত-বিহ্বল, বুদ্ধিমান মানুষগণ খাব ও বিদারীর অনির্দিষ্ট অবস্থায় শঙ্কিত। চারিদিকে "চাচা-আপন প্রাণ বাঁচার" কলকোলাহল ধ্বনিত। প্রত্যেকটি মানুষ নিজ আত্মীয়-এগানাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। বিপদ-আপদের সর্বগ্রাসী তুফান দীন ও মযহাব, তাহ্‌জীব ও তামাদ্দুন, তওহীদ ও ন্যায়কে ধুইয়া মুছিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ইহা কিয়ামত-ময়দানের অস্বাভাবিক দৃশ্যের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।"

"বিপ্লবের এই কঠিন সময় ইসলামের সহায়তা ও প্রচার প্রতিষ্ঠার অন্তহীন সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে একটি দল। কুফর ও গোমরাহীর কোন প্রবল শক্তিও উহাকে বিন্দুমাত্র প্রতিরুদ্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না। ইহারা অন্যায়ের ও গায়র-ইসলামী আকীদা আখলাকের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্তভাবে চালাইয়া যাইতেছে এক ক্ষমাহীন অভিযান। বর্তমান সময় সমস্ত মুসলিম সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত, ইহারাই তাহার প্রথম দল। দ্বিতীয় দল অক্ষম, শক্তিহীন ও পঙ্গু। আর তৃতীয় দল নিজেদের নফসের উদ্দাম লালসা-বহ্নির ইন্ধন যোগাতেই দিনরাত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। তাতারদের এই অমানুষিক আক্রমণ, এই ধ্বংসলীলা বস্তুত একটি মহা পরীক্ষা। এইখানে আসিয়া সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পন্থী মানুষ মুনাফিকদের দল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া যাইবে। ইহারা নিজেদের কর্মের বিনিময়ে ইহকাল ও পরকালে পাইবে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত; আর মুনাফিকদের পরিণতি ? তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহ্‌র মর্জীর উপর।"

অন্যদিকে মিসর-রাজের নিকটও চিঠি লিখিয়া শেষবারের মত তিনি জানাইলেন যে, তাতারগণ ইসলামী রাজ্যগুলিকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে, ইহার বিরুদ্ধে এখন জিহাদ করা ভিন্ন আর কোনই উপায় নাই।

এই যুক্তিপূর্ণ ও উত্তেজনামূলক খোলা চিঠি সারা মুসলিম দুনিয়ায় একটি প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সৈন্য-বাহিনীতে। তাহারা তাতারদের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের

মত অটল ও দুর্লংঘ হইয়া দাঁড়াইল। ফলে তাতারী সৈন্যগণ রীতিমত ভয় পাইয়া গেল এবং তাহারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। একদল যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নবী মুস্তফা (সা)-এর জীবনে খন্দকের যুদ্ধে যেমন কাফির সৈন্যগণ পারস্পরিক মতভেদের কারণে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক তদ্রূপ তাতার সৈন্যগণ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। তবুও যে অল্প সংখ্যক সৈনিক অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল, তাহারাও সংখ্যার দিক দিয়া মুসলমান সৈন্যদের অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী ছিল। কিন্তু মুসলিমগণ যুদ্ধে যোগদান করিয়াছি নূতন উদ্যম ও তাজা ঈমানী শক্তি লইয়া, তাই তাহারা তাতারদের অতি সহজেই পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তাতারদের সঙ্গে যেসব মুনাফিক (মুসলমান) যোগ দিয়াছিল, তাহারা নিজেরাও তাতার দস্যুদের হাতে লাঞ্ছিত ও নিহত হইয়াছিল। মুসলমানদের এই গৌরবপূর্ণ বিজয় তাহাদের মনে জাগাইয়া দিল এক নূতন ঈমান ও সত্য প্রতিষ্ঠার এক অভিনব দৃঢ়তা। চারিদিকে তওহীদের বিপ্লবী পতাকা উড্ডীন হইতে লাগিল। কুরআন ও হাদীসের ভিত্তি আবার নূতন করিয়া স্থাপিত হইল।

৭০২ হিজরীতে "শাকহাব"-এর দুর্ঘটনা ঘটে। এই সময় মুসলিম সমাজের উপর যে নানাবিধ বিপদ, মুসিবত ও দুঃখ-দুর্ভোগ আপতিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার মত ভাষা নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ইবনে তাইমিয়ার দুরন্ত ঈমান ও অনমনীয় তেজস্বিতার ফলে মুসলমানগণ জয়লাভ করিয়াছিল, বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল।

"শাকহাব" যুদ্ধের পর ৭০৪ হিজরীতে "কাছরাওয়াঁ" পর্বতের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই পর্বতের গভীর গুহার অন্তরালে বাস করিত একদল দুর্ধর্ষ দস্যু, পথচারীদের উপর আকস্মিক হামলা চালাইয়া নির্মমভাবে লুঠতরাজ করাই ছিল এই দলের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। কোন আইন ও শাসনের অধীনতা তাহারা স্বীকার করিত না, বিন্দুমাত্র ভয় করিত না কাহারও হুমকি। ইহারা এতদঞ্চলের একটা ভয়ানক বিভীষিকার কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি তাহাদের সঙ্গে তাতারদের গোপন যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া মানুষের এই দুঃখে ব্যথিত ও সহানুভূতিশীল হইয়া এইদিকে মনোনিবেশ করিলেন। সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে চিঠি পাঠাইয়া তিনি মুসলমানদিগকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তিনি নিজেও সহকারী সেনাপতির সহিত একত্রিত হইয়া দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। "কাছরাওয়াঁ" পর্বত এত বন্ধুর ও দুর্লংঘ ছিল যে আজ পর্যন্ত কোন দেশ-বিজয়ী সেনাপতিও এই পাহাড় অতিক্রম করিয়া দস্যুদের উপর আক্রমণ চালাইবার দুঃসাহস করে নাই। কিন্তু এই গৌরব সর্বপ্রথম বীর মুজাহিদ ও সপ্তম হিজরীর মুজাদ্দিদ ইবনে তাইমিয়াই অর্জন করিলেন। কাছরাওয়াঁ অধিবাসী দস্যুদের সংগ্রাম ৭০৫ হিজরীর মধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই বিজয়ী মুসলিম মুজাহিদ যখন দামেশকে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাদের এক অপূর্ব রাজকীয় সম্বর্ধনা জানান হইয়াছিল।

উপসংহার

হিজরীর সপ্তম হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম তথা সারা মুসলিম দুনিয়ার উপর, দীন ও ঈমান হারাইবার ও আকীদা-আখলাক বিকৃত করিবার কারণে এক আল্লাহ্কে এবং তাঁহার দেওয়া বিধানকে ভুলিয়া যাওয়ার নিমিত্ত তাতারী আক্রমণরূপে আল্লাহ্র যে ব্যাপক অভিশাপ নাজিল হইয়াছিল, যে সব বিপদ আপদ এবং ধ্বংস ও ভাঙনের বিভীষিকা আসিয়াছিল, একমাত্র ইমাম ইবনে তাইমিয়ারই হৃদয়ে ও সূক্ষ্মদর্শী অন্তর্দৃষ্টিতে তাহা উজ্জ্বল হইয়া ধরা পড়িয়াছিল। তখনো ইসলামী দুনিয়ায় অনেক আলিম ছিলেন, ছিলেন অনেক ধার্মিক ও পীর-বুজর্গ। কিন্তু তাহারা কেহই নিজেদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের নিবিড় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া এই মহাবিপদ দূর করিবার জন্য মাত্রই চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের এই কঠিনতম মুহূর্তে ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে পাঠাইয়াছিলেন যুগের মুজাদ্দিদ করিয়া। মুজাদ্দিদ হইবার জন্য যেসব কাজ করিতে হয় তাহা সবই সমাধা করিয়াছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রে ও তামাদ্দুনে যে পরিপূর্ণ ইনকিলাব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক, ইমাম ইবনে তাইমিয়া আসিয়াছিলেন বিপ্লবের সেই বাস্তব রূপ লইয়া। তিনি তাঁহার সংগ্রামময় জীবন দ্বারা দেখাইয়া গেলেন জাহিলিয়াতের শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে কেমন করিয়া লড়াই করিতে হয়, কেমন করিয়া মানুষের ইসলাম-বিরোধী আকীদা-আখলাক, ধারণা ও মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করিয়া ইসলামের বুনিয়াদী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলার ভুলিয়া যাওয়া শিক্ষাকে কেমন করিয়া অভিনবভাবে মানুষকে শিখাইতে হয়, বাতিলের বিরুদ্ধে লেখনী শক্তি ও বাগ্মিতা তথা বাস্তব জিহাদী শক্তি নিয়োজিত করিয়া অশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়, তাহার পরিপূর্ণ হিদায়েত আমরা পাইতেছি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জীবন হইতে। তাই ইসলামী ইনকিলাব সাধনার প্রত্যেক মুজাহিদের পক্ষে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জীবনী একটা অনির্বাণ দীপ শিখার মত চিরকালের তরে অক্ষয় আদর্শ হইয়া থাকিবে।

ইফাবা—২০০৬-২০০৭ প্র/১৪১০-(উ)-৩,২৫০